বীরভূমি

৪র্থ ভাগ]　　কার্ত্তিক, ১৩০৯।　　[৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
৫০৪/৪

মৃগমদকস্তূরী।

লতাকস্তূরী গাছড়া জিনিস। মৃগমদ কস্তূরী গাছড়া নয়;—জান্তব পদার্থ, জন্তুর শরীরে উহার উৎপত্তি। এক প্রকার হরিণ আছে, তাহাদের পুরুষ জাতির নাভির স্থানে একটী কোষ হয়। সেই কোষে কস্তূরী জন্মে। তাই এজাতীয় হরিণকে কস্তূরীমৃগ বলে।

কস্তূরীমৃগ যেথানে সেথানে থাকে না। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে, সাইরিয়াতে, চীনে এবং টঙ্কিনে ইহাদের বাস। হরিণ জাতির স্বভাব,—তাহারা দল বাঁধিয়া এক সঙ্গে অনেকে থাকিতে ভালবাসে; এক সঙ্গে অনেকে মিলিয়া চরিয়া বেড়ায়। মৃগমদ হরিণের স্বভাব সে রকম নয়। তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা শশকের মত। তাহারা একস্থানে একাকীই থাকে।

এই হরিণ অধিক বড় হয় না। লেজের গোড়া হইতে মাথা পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাত লম্বা। আমাদের বাঙ্গালাদেশে সচরাচর ছাগল যত বড় দেখা যায়, কস্তূরীমৃগও প্রায় তত বড়। ইহাদের শিং নাই। উজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষু ঢলঢল করিতেছে। তারা ও দুই কোন্ মিস্‌মিসে কাল; বিধাতা যেন অপাঙ্গ ভরিয়া দলিত কজ্জল মাখাইয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। কাণ লম্বা, কর্ণ এবং চক্ষু দেখিলেই যেন বুঝা যায়, এই হরিণ অতিশয় ভীরু। অল্প শব্দ পাইলেই কাণ খাড়া করিয়া চকিত চিত্তে, চঞ্চল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া পলায়।

ইহাদের ঘাড় হইতে পিঠের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘন ঘন লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা। বিলাতিপুস্তকে এবং রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচারে কস্তূরীমৃগের যে চিত্র আছে, তাহা ঠিক নয়। ঘাড়ের উপর এবং পৃষ্ঠদেশে যে প্রকার লোম আঁকা হইয়াছে, তাহা খুব ছোট দেখায়। পূর্ণবয়স্ক মৃগের ঘাড়ের লোম

আরও অনেক বড়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্রের ভুল ধরি না, তিনি তো কেবল দাগার উপর দাগা বুলাইয়াছেন; কিন্তু বিলাতি ছবিতে ভুল হইল কেন, জানি না।

লোমগুলি মিহি নয়, খুব মোটা মোটা। কিন্তু মোটা হইলেও কর্কশ নয়;— বেশ নরম, ছুঁইলে যেন মনে হয় শশকের গায়ে হাত পড়িয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গের লোমের বর্ণ একরকম নয়; ঘাড়ের এবং পিঠের লোমও এক রকম নয়,—শাদা, কাল ও পাটকিলে মিশানো। শিকারীরা বলে ঋতুভেদে বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটে। গ্রীষ্মকাল আসিলে অধিকাংশ লোম কাল হইয়া পড়ে। শীতে শাদা হয়, আর অন্য অন্য ঋতুতে কাল, শাদা ও পাটকিলে মিশিয়া থাকে। বুড়া হইলে মানুষের মাথার চুল পাকে,—কাল চুল শাদা হইয়া যায়। বুড়া হইলে কস্তূরীমৃগেরও অধিকাংশ লোম শাদা হয়।

ঘাড়ে পিঠে এবং গায়ে লোমগুলি খুব ঘন করিয়া সাজানো। এইরূপ নিবিড় লোম সমাবেশের পারিপাট্য দেখিলে বুঝা যায়,—এই পশু গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানের নয়। যেখানে হিমের প্রভাবে মহিষের শিং কাঁপিয়া উঠে, সেই চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতের গায়ে ইহারা চরিয়া বেড়ায়।

কস্তূরীমৃগের লেজ খুব ছোট। অন্য কোন হরিণের গজদন্ত নাই; কস্তূরীমৃগের মুখের দুই পাশে দুইটী গজদন্ত আছে। উপর পাটির কস হইতে সরু লম্বা দাঁত দুইটী বাহির হইয়া নিম্ন পাটির ঠোঁটের উপর বক্র হইয়া আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। খুর পশ্চাদ্‌দিক্ হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়া সম্মুখে তীরের ফলার মত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। ক্ষুরের দুই পাশ এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। ডগা ঠিক যেন নরুণের মত সূচল। বোধ করি, বোতলভাঙ্গা কাচের মত ইহাদের ক্ষুরেও কামাইতে পারা যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির ভিতরে কিছুই নিরর্থক নাই, বিশ্বব্যাপারের সূক্ষ্মবিষয়ে বুদ্ধি যায় না, নচেৎ বুঝিতে পারিলে, সকল কাজেই তাঁহার এক একটী গূঢ় অভিপ্রায় বাহির হইয়া পড়ে। কস্তূরীমৃগের ক্ষুর এত সূচল কেন এবং লম্বা দাঁত দুটী নিম্নদিকে কেন বক্র হইয়া আসিয়াছে, উহাদের প্রকৃতি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল পা এবং মুখ সাজাইবার জন্য সূক্ষ্ম ক্ষুর এবং বক্র গজদন্ত দেন নাই। ঈদৃশ ক্ষুর এবং দাঁত হরিণদের প্রাণরক্ষার উপায়। পর্ব্বতের খুব উচ্চ ঢালু প্রদেশে,

যেখানে মনুষ্যের বা হিংস্র পশুর গ[illegible] নাই, সেই দুর্গম নিভৃত স্থানে কস্তূরীমৃগ চরিয়া বেড়ায়। একটু শব্দ পাইলেই আরও উচ্চতর শিখর-দেশে গিয়া উঠিয়া পড়ে। যেখানে অন্য জন্তু কিছুতেই যাইতে পারে না। তেমন দুরারোহ স্থান দিয়াও উহারা অক্লেশে ছুটিয়া পলায়। ক্ষুর খুব তীক্ষ্ণ ও সূচল, কাজেই নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে সহজেই পা পাতিয়া রাখিতে পারে এবং গজদন্ত দুটী নিম্নদিকে বক্র, সে কারণ ক্ষুরে ভর দিয়া এবং পর্ব্বতের গায়ে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া সুস্থির ভাবে দাঁড়াইতে বেশ সুবিধা হয়। অনেকে শিক্ষিত রামছাগলের 'কস্‌লত দেখিয়াছেন। একটা বৃহদাকার ছাগল সামান্য একটী লাঠির ডগায় চারি পা যুড়িয়া রাখিয়া অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকে, নড়ে না চড়ে না, হেলে না দোলে না। পাহাড়ের গায়েও যাতায়াত করিতে ছাগলদের সাধা পা, তাহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত। খুব সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া দৌড়িয়া যাইতে উহাদের কষ্ট হয় না। যেখানে অন্য জন্তুর পা স্থির থাকে না, অন্য জন্তু যেখানে যাইতে পারে না, যাইতে গেলেও পা হড়িয়া খড়ের ভিতরে পড়িয়া যায়; ছাগলেরা সেখানে মাথা গুঁজিয়া পা বাঁকাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া রাতা-সের উপর ভর দিয়া ছুটাছুটি করে। তাই পাহাড়ীরা পর্ব্বতে বোঝা বহাই-বার নিমিত্ত ছাগল পোষে, অনেক প্রকার হরিণও পর্ব্বতের দুরারোহ স্থানে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায়; ছুটাছুটি করে, খড়ের একদিক হইতে অন্য দিকে লাফাইয়া পড়ে। আল্প পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে অনেক সময়ে শিকারীরা খড়ে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। দুরারোহ স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিতে কস্তূরী মৃগের ক্ষমতা সকলের চেয়ে বেশী। সোজা পাহাড়ের ঢালু গায়ে দুই অঙ্গুল স্থান পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগকে শিকার করা বড়ই কঠিন। তাহার উপর আবার ভয় অন্য কোনও জীবের আছে কি না জানি না। তুলনা দিতে হইলে বুঝি শশককেই আগে মনে পড়ে। বাতাস না বহিতেই আগে কাঁপিয়া উঠে কদলীপত্র, বিপদ না ঘটিতেই আগে হৃদাত্মা চমকিয়া উঠে শশকের, কস্তূরী মৃগের ভয় আরও বেশী, সদাই ব্যস্ত, সদাই নানা প্রকার শঙ্কাতে প্রাণ আকুল; তাই কচিৎ তাহারা তরাইয়ের নিম্নে চরিতে আসে। পাহাড়ের গায়ের ছেত্‌লা, শেওলা এবং ছোট ছোট তৃণাদিই ইহাদের খাদ্য এবং পানীয়—নির্ঝরের জল। তবে একেবারেই

তাহারা তরাইয়ের নিম্নে আসে না, এমত নহে। নির্জন স্থান পাইলে চারি দিকে চাহিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসে।

এই মৃগের পুরুষ জাতির নাভির উপরে পুরুষাঙ্গের ঠিক সম্মুখে একটী কোষ জন্মে, তাহাই কস্তূরীর আধার। কস্তূরীনাভির সম্মুখ দিক কিছু মোটা পশ্চাদ্ দিক্ অপেক্ষাকৃত সরু। উপরি ভাগ চেপ্টা। হরিণের পেট হইতে কাটিয়া লওয়া হয় বলিয়া এই দিকে কাটার দাগ থাকে। নিম্ন ভাগ কুব্জাকার, মধ্যস্থল হইতে দুই পাশ গোলাভাবে ঢালু হইয়া গিয়াছে। বড় নাভি প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা, আড়ে ন্যূনাধিক দেড় ইঞ্চ এবং পৌনে এক ইঞ্চ স্থূল। ছোট নাভিতে প্রায় ত্রিশ গ্রেণ কস্তূরী থাকে। বিলাতি পুস্তকের মতে বড় নাভিতে ছয় ড্রাম পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। একথা বিশ্বাস করিব কি না, একবার দেখিলে বলিতে পারি।

শিশু হরিণের কস্তূরী কোষ থাকে না। যৌবনের ভাব, লাবণ্যের ছটা একটু ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, কস্তূরীকোষের অঙ্কুর আসিয়া দেখা দেয়। ক্রমে পুরা যৌবনের অঙ্গভরা কান্তি হাসিয়া আসিলে সেই অঙ্কুর পরিপুষ্ট হইয়া পড়ে। কোষের ভিতরে খুব পাতলা ঝিঝিরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে। ঐ ঝিল্লী কোষের ভিতর দিকে গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। দেখিতে বাদুড়ের ডানার চর্ম্মের মত,—পাতলা, কটাসে কৃষ্ণবর্ণ,—খুব ফিকে নয়, খুব গাঢ় কালও নয়। অভ্যন্তরের কস্তূরী এবং উপরের চর্ম্ম হইতে এই ঝিল্লীকে পৃথক্ করিয়া ফেলা যায়। আমাদের শরীরে অন্ত্র, ফুস্ফুস প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ঢাকা আছে। ঐ সকল ঝিল্লী হইতে প্রতিনিয়ত এক প্রকার রস বাহির হইতেছে। কস্তূরীকোষের ভিতরে যে ঝিল্লী আছে, তাহা হইতেও রস নিঃসৃত হয়। ঐ রসই মৃগমদ কস্তূরী।

জীবিত হরিণের কোষের ভিতরের কস্তূরী পাতলা ও আগের মত চট্‌চটে। বাতাস লাগিলে আর পাতলা থাকে না, জমিয়া যায়। কিন্তু বাতাস না লাগিলে গাঢ় হয় না।

যৌবনের প্রারম্ভে কোষ বাহির হইলেও প্রথম প্রথম তাহাতে অধিক কস্তূরী থাকে না। কস্তূরী সঞ্চয় হওয়া পূর্ণ পুরুষত্বের লক্ষণ। তাই বৃদ্ধ হরিণদের কোষেও কস্তূরীর পরিমাণ খুব কম। পূর্ণ যৌবনকালেই কস্তূরী-রসে নাভি ঠেলিয়া উঠে; আবার প্রজনঋতুতে নাভিতে যেন কস্তূরীরস আর ধরে না। শুনিতে পাই, শ্রাবণ ভাদ্র মাসই উহাদের সঙ্গম কাল। হরিণীরা এই সময়ে ঋতুমতী হয়। মৃগেরা যতই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া বেড়ায়, কোষ ততই যেন কস্তূরী নিঃস্রাবে ফাটিয়া পড়ে। কোষের মধ্যে অধিক কস্তূরী জমিলে হরিণের রক্ত মাংস মল মূত্রও তীব্র মৃগমদগন্ধে ভর্ ভর্ করে। কোন স্থান দিয়া ছুঁচো ছুটিয়া গেলে, কিংবা কোন স্থানে থটাস অথবা বোকা পাঁঠা থাকিলে চতুর্দিকে বোট্‌কা গন্ধে ভরিয়া যায়। কস্তূরীমৃগের শরীরেও মৃগমদ জমিলে তাহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলে। হরিণটাও তখন আপনার গন্ধে আপনি পাগল, ছট্ ফট্ করিয়া কেবল এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়।

কস্তূরীকোষ দেখিতে কতকটা অণ্ডের মত। তবে ঠিক অণ্ডাকার নয়, বরং কিছু চেপ্টা। নিম্নের লোমগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক মধ্যস্থলে আসিয়া ফুরাইয়াছে। অনেক মানুষের মাথার সম্মুখের চুল ঘুরাণো ঘুরাণো। লোকে তাহাকে মরাই বলে। অনেক ছাগলের ও গোরুর পেটের ও পিঠের এক এক জায়গার লোম পাক-দেওয়া পাক-দেওয়া থাকে। কস্তূরী কোষেরও নিম্নভাগের লোমগুলি মরাইয়ের মত পাক দিয়া সাজানো,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যস্থলে আসিয়া লোমের মুড়া মরিয়াছে—এই খানেই লোমের বেড়ের শেষভাগ। এই অণ্ডভাগের মধ্যস্থলে বাহির হইতে ভিতর পর্য্যন্ত একটী ছিদ্র আছে। হরিণ, কস্তূরীভারে সুস্থির হইতে না পারিলে চারিদিকে ঘুঁটিয়া বেড়াইয়া শেষে পাহাড়ের গায়ে গিয়া নাভিঘর্ষণ করে। তখন ঐ ছিদ্র দিয়া ঝর্ঝর করিয়া কস্তূরিরস গলিয়া পড়ে। পরে বাহিরের বাতাসে জমিয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে এইরূপ ক্ষরিত কস্তূরীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহোপকারী। সঙ্গমকাল অতীত হইয়া গেলে নাভির ভিতরে আর অধিক কস্তূরী থাকে না। আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিলে, আষাঢ় ফুরাইয়া শ্রাবণ মাস পড়িলে হরিণদের নাভি পুনর্ব্বার কস্তূরীরসে ফুলিয়া উঠে।

দুগ্ধবতী ছাগলকে মারিয়া ফেলিলে মৃত্যুর পর আর তাহার বাঁটে দুগ্ধ থাকে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালান ও বাঁটে দুগ্ধশূন্য হইয়া যায়। কস্তুরী মৃগেরও জীবিতাবস্থায় নাভিকস্তুরীতে পরিপূর্ণ থাকিলেও, শিকারীরা যদি একেবারে তাহাকে মারিয়া ফেলে, তবে নাভিতে কিছুই কস্তূরী থাকে না,—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টুকু গায়ে চড়িয়া যায়। সে কারণ বন্দুক দিয়া কস্তূরী মৃগকে শিকার করা চলে না। গুলি লাগিলে তখনি মৃগের প্রাণ-

বিয়োগ হয়। তাই শিকারীরা তীর দিয়া বিঁধিয়া আগে হরিণকে জকম করিয়া ফেলে। আহত মৃগ পলাইতে পারে না, ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, উলটি পালটি খায়,—সেই অবসরে শিকারিরা ছুটিয়া গিয়া প্রথমে নাভির উপরিভাগ দড়ী দ্বারা খুব কসাকসি করিয়া বাঁধিয়া পেট হইতে সমস্ত কোষটী কাটিয়া লয়। পরে শীঘ্র শীঘ্র নাভির নিম্নের ছিদ্রে একটী নল পরাইয়া দেয়। ঐ নলের ছিদ্র দিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা তরল কস্তূরী গাঢ় হইয়া যায়। নল পরাইতে বিলম্ব হইলে ভিতরে কিছুই কস্তূরী থাকে না। টাট্‌কা কস্তূরীর গন্ধ অতিশয় তীব্র, সকলে সহ্য করিতে পারে না। উহার উগ্র আঘ্রাণে রক্তবমনও হইয়া থাকে। তাই নাভি কাটিতে যাওয়া কতকটা ভয়ের কথা। নাভি কাটিবার সময়ে শিকারিরা নাকে পুরু কাপড় জড়াইয়া রাখে; তজ্জন্য আঘ্রাণে পীড়া জন্মিবার বড় সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞ লোকেরা কি বলিতেন, জানি না; কিন্তু সেকালে ঘরাও মজলিসে একটা খোস গল্প চলিত ছিল,—কস্তূরীমৃগের হাঁটুরজোড়ে না কি খিল নাই;—তাহারা হাঁটু দোম্‌ড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঁজিতে পারে না। সমস্ত পা এক খানা সোজা শক্ত কাঠের মত কাজেই হরিণগুলা শুধুই দাঁড়াইয়া থাকে; বিধাতা তাহাদের কপালে শুইবার সুখ লেখেন নাই। যাহারা পাগুলা এমন আড়ষ্ট, সে জন্তু মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহার উঠিবার সঙ্গতি কৈ? তাই মৃগয়া করিতে গিয়া শিকারীরা নাকি তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া হরিণকে মাটীতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ মৃগটা মাটীতে পড়িয়া গেলেই অমনি সকলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

এখন রাত্রি পোহাইয়াছে, কাকেরা দুই চক্ষুতেই দেখিতেছে,—মৃগমদ হরিণরাও এখন হাঁটু নোয়াইতে পারিতেছে; তাহারা মাটীতে গা পাতিয়া শুইয়া বাঁচিতেছে।

কস্তূরী মৃগের শিশুকে ধরা বড়ই কঠিন। তবে কখনও ধরা যায় না, তাহা বলি না। জিনিসটা খুব দুর্লভ এবং কাজটা বড়ই দুঃসাধ্য, তাহাই বলিতেছি। যেবার মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্‌ এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি একটী বাচ্ছা উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। আমাদের বন্ধু, কুমায়ুনের চিন্তামণি জ্যোষির ভ্রাতা অম্বাদত্তের একটী পোষা কস্তূরী মৃগ ছিল।

মৃগমদ হরিণ আজও সত্যযুগের মাস্মথ হয় নাই,—এখনও এই মৃগ পাওয়া যায়। যখন কস্তূরীমৃগ আছে, তখন খাঁটি কস্তূরীও আছে, কিন্তু সে জিনিস শিকারীদের নিজস্ব করা একচেটিয়া, তাহা খরিদদারদের ভাগ্যে জোটে না। খরিদদারেরা পায় রক্ত মাংস, নাদি ও আটা,—শ্রবণসুখের জন্য পায় সেই মধুর নামটী,—বিশুদ্ধ আসল মৃগমদ কস্তূরী।

খাঁটি কস্তূরী খুব কম মিলে; কিন্তু গ্রাহক অনেক। যে জিনিস কম জন্মে, কিন্তু যাহার কাট্‌তি বেশী, তাহাতেই অধিক ভেল। কলিকাতায় সুস্বাদু খাঁটি ঘৃত আর নাই। ঘৃতের ভিতরে শুধুই সাপ বেঙের চর্ব্বি। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা কস্মিন্‌কালে আমেরিকার আমেজন নদ দেখেন নাই। শিক্ষকেরা মানচিত্রে একটা লম্বা কাল সূতার মত দাগ দেখাইয়া আমেজন নদ বুঝাইয়া দেন। খাঁটি দুগ্ধ কেমন, কলিকাতার লোককে সে কথা বুঝাইতে হইলে চক্ষের কাছে বকের একটী পালক ধরিতে হয়। আর খাঁটি মৃগমদ কস্তূরী নাই। খাঁটি কস্তূরী কেমন, একথা বুঝইতে হইতে হইলে ছুঁচো শুঁকিতে পরামর্শ দিতে হয়। ছুঁচো শোঁকা ভিন্ন অন্য সহজ উপায় আর কিছুই দেখি না। জগতে আর মোমাই নাই, খাঁটি কস্তূরীও নাই। শিকারীরা খাঁটি কস্তূরী দেয় না, দিলে তাহাদের ব্যবসায় চলে না।

গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অনেক কস্তূরীর পরীক্ষা করিয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে খাঁটি জিনিস কখনও চক্ষে ঠেকে নাই। নেপালের এবং নাইনীতালের আমাদের পরম আত্মীয় ব্যবসায়ীও খাঁটি জিনিস দিতে পারেন নাই। আসাম এবং দার্জ্জিলিং হইতে আমার আত্মীয়েরা যে জিনিস পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও খাঁটি নয়। বিশেষ সুযোগে আমি তিন বারে তিনটী আসল নাভি পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে সুবিধা সচরাচর অদৃষ্টে ঘটে না।

শিকারীরা অনেক প্রকারে জিনিস ভেল করে। পাহাড়ের দুর্জয় শীতে মাংস প্রভৃতি পচে না, দীর্ঘকাল থাকিলে শুকাইয়া যায়, তাই শিকারীরা হরিণের পেটের চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া তাহার মধ্যে টাট্‌কা রক্ত পূরিয়া দেয়। পরে এমন কৌশলে সমস্ত টুকু কোঁচকাইয়া আঁটিয়া বাঁধে যে, ঠিক প্রকৃত নাভির মত লোম পাক দেওয়া; উপরে চেপ্‌টা কাটার দাগ,—ফলকথা নাভিটা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, তাহা বুঝিয়া লইতে কিছু কষ্ট হয়।

এই গেল নাভির কথা। কস্তূরী ভেল করিবারও কৌশল অনেক। আসল কস্তূরী কাল ও কটাসে। কটাসে কস্তূরীই ভাল দানা ছোট ছোট; চট্‌চটে ও চেপ্‌টা চেপ্‌টা। চিবাইলে অল্প তিক্ত লাগে ও দাঁতে জড়াইয়া যায়। অধিক নাড়িয়া চাড়িয়া আঘ্রাণ লইলে এবং অধিক পরিমাণে খাইলে গা বমিবমি করে। এই সকল গুণের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত শিকারীরা পূর্ব্বাহ্নে কস্তূরীমৃগের রক্ত, মাংস ও বিষ্ঠা একত্র কুটিয়া তাহাতে গাছের আটা তিক্তপাতার রস মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ ছাগমূত্র দিয়া শুকাইয়া রাখে। টাট্‌কা নাভির ছিদ্রে নল পরাইয়া দিলে ভিতরে কস্তূরী গাঢ় হইয়া যায়। তখন নলটী খুলিয়া আসল কস্তূরী বাহির করিয়া লইয়া ভিতরে মৃগটার টাট্‌কা রক্ত, সীসা, বালি ও, প্রস্তুত করা কুট্টিত মাংস প্রভৃতি পূরিয়া দেয়। কাজেই নাভিটার বাহিরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভিতরের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার যো নাই। অতএব ভিতরে খাটি জিনিস আছে কি না, তাহা বুঝিতে হইলে নাভিটী কাটিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু কেবল চোখের দেখায় জিনিসের ভাল মন্দ বিচার হয় না। চাকিলে নয়, নাড়িলে চাড়িলে নয়, আঘ্রাণেও নয়। রাসায়নিক পরীক্ষাই বিশুদ্ধ কস্তূরী চিনিবার একমাত্র উপায়। কি প্রকারে বিশুদ্ধ কস্তূরী চিনিতে হয়, তাহার উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

উৎকৃষ্ট কস্তূরী চিনিবার নিমিত্ত চক্রদত্তে যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

"ঈষৎ ক্ষারানুগন্ধা তু দগ্ধা যাতি ন ভস্মতাম্।
পীতা কেতকগন্ধা চ লঘুস্নিগ্ধা মৃগোত্তমা।"

যে মৃগমদ ঈষৎক্ষার গন্ধযুক্ত; পোড়াইলে ভস্ম হয় না। পীতবর্ণ, এবং যাহাতে কেয়া ফুলের মত অল্প অল্প ঠাণ্ডা গন্ধ আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

প্রাচীন পুস্তকে আছে বলিয়া এই প্রমাণটা তুলিয়া দিলাম। কস্তূরী পরীক্ষার প্রশস্ত উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। কস্তূরীতে বালি মিশ্রিত থাকিলে চিবাইলে কির্‌কিরে লাগে।

২। রক্ত মিশ্রিত থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তূরী রাখিয়া অগ্নি শিখার উপরে ধরিলে পুড়িবার সময়ে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন উহার ফাণ্টো পার্‌ক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্করির দ্রব দিলে রক্তের আল্‌ব্যুমেনের তলানী পড়ে।

৩। সীসা থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তূরী রাখিয়া অগ্নি-শিখার উপরে ধরিলে সীসা গলিয়া বাহির হইয়া যায়।

৪। খাঁটি কস্তূরী পোড়াইলে অগ্নির শিখা শাদা রঙের হয়; এবং পুড়িয়া গেলে খুব হাল্‌কী ও স্পঞ্জের মত ফাঁপা কয়লা পড়ে।

৫। চা ভিজাইবার মত খুব ফুটিত উষ্ণজলে ফাণ্টা প্রস্তুত করিলে বিশুদ্ধ কস্তূরীর শতকরা আশী ভাগ দ্রব হইয়া যায়। কস্তূরী ভেল হইলে অনেকটা পড়িয়া থাকে; খারাপ জিনিসের কিছুই দ্রব হয় না বিশুদ্ধ কস্তূরীর ফাণ্টা কটা ও লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

৬। বিশুদ্ধ সুরাতে কস্তূরী ভিজাইলে প্রায় অর্দ্ধাংশ গলিয়া যায়। অরিষ্টের বর্ণ রক্তপীত। তাহাতে জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধবৎ হয়।

৭। ইথারে ভিজাইলে খাঁটি কস্তূরীর প্রায় কিছুই থাকে না।

৮। বিশুদ্ধ কস্তূরীর ফাণ্টে লিট্‌মস্‌ দ্রব দিলে রক্তবর্ণ হয়। কৃত্রিম জিনিসে সেরূপ হয় না।

৯। খাঁটি কস্তূরীর ফাণ্টে পার্‌ক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্করি দ্রব মিশাইলে কিছুই তলানী পড়ে না।

১০। খাঁটি জিনিসের ফাণ্টে হীরাকস, আসিটেট্‌ অব্‌ লেড্‌ কিংবা মাজুকলের ফাণ্ট মিশ্রিত করিলে তলানী পড়ে। কৃত্রিম জিনিস হইলে ঐ সকল দ্রব্যের সহযোগে তলানী পড়ে না।

১১। ঐ ফাণ্টের সঙ্গে নাইট্রেট্‌ অভ সিলভার দ্রব মিশাইলে শ্বেতবর্ণ তলানী পড়ে। তাহার পর উহা আলোতে রাখিলে ফিকে নীলবর্ণ হইয়া যায়।

১২ নাইট্রেট্‌ অব্‌ মার্করির সঙ্গে ঐ ফাণ্ট মিশ্রিত করিলে কটাবর্ণ তলানী পড়ে।

১৩। ইথরের অরিষ্ট জলের উপরে রাখিয়া বাষ্পস্বেদ দ্বারা উড়াইয়া দিলে নিম্নে কটাবর্ণ, চট্‌চটে আটার মত দ্রব জমিয়া যায়, উহাতে জল মিশাইলে দুগ্ধবৎ হয়।

মৃগমদকস্তূরীর রাসায়নিক পরীক্ষার কথা এই পর্য্যন্তই ভাল। মৃগমদ কিনিতে হইলে আগে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মুখে চাকিয়া এবং নাকে আঘ্রাণ লইয়া কিনিলেও ঠকিতে হয়। এখানে আরও একটা বেশী কথা বলিয়া রাখি; বাহারে আকাশকুসুম এবং বিশুদ্ধ নামের মৃগমদকস্তূরী ক্রয় করিতে গেলেই হাতে হাতে ঠকিতে হয়। শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

জাল প্রতাপচাঁদ।

পরাণ বাবুর নানা কৌশল ও কাঞ্চননগর হইতে দূরীকরণ।

কাঞ্চননগরে প্রতাপচাঁদের আদর দেখিয়া পরাণ বাবুর ভয় হইল।

জনরবে পরাণের প্রাণ উড়ে যায়।
কিসে নিবারণ করি এহেন জনায় ॥
আপন জননী তারে কহিল বিশেষ।
তন্ত্র মন্ত্র আরব্ধ করিল দিতে ক্লেশ ॥
মন্ত্র বাণ নিক্ষেপণ করে দুষ্ট চিত।
অঙ্গে না পরশি বাণ ছেদ হইল ভিত ॥
অট্টালিকা করি ভেদ বাণ গেল চলি।
অন্তর্য্যামী জানিয়া করেন পদচালি ॥
কথার প্রসঙ্গে কথা করেন প্রচার।
বাণ ব্যর্থ হইল পাইল সমাচার ॥
সহরে হইল গোল ভাবিত পরাণ।
কেমনে সন্ন্যাসী যায় করয়ে সন্ধান ॥
রহিলে সন্ন্যাসী বড় হইবে সঙ্কট।
করিল সংবাদ মেজেষ্টরের নিকট ॥
সহর হইতে দূর করি দিবার প্রার্থনা।
সাদর করিতে সাধ নাতক পরোয়ানা ॥
এ আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলেক মেজেষ্টর।
জজকে জানায় একথার প্রত্যুত্তর ॥
শুনি জজ মাজেষ্টর কালেক্টরে লইয়া।
ভাক্ত সন্ন্যাসী হইলে আনিব ধরিয়া ॥
এভাবে সাহেব লোক যায় দেখিবারে।
পাঠায় চাপরাশী এক থাকিয়া অন্তরে ॥
সন্ন্যাসীরে কহয়ে আসিয়া করে দেখা।
হুকুমে চাপরাশী যায় মর্জ্জি করি বাঁকা ॥
গতমাত্র দৃষ্ট করি টুটে অহঙ্কার।

জোর হাতে বিনয়ে কহিল সমাচার।
শুনিয়া সন্তোষ হইয়া কহিলেন হাসি।
কি কাজ সাহেব দেখা আমিত সন্ন্যাসী ॥
দেখিবার থাকে সাধ আসুক সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বরীত বর্ত্ত মত করিব পশ্চাৎ ॥
শুনিয়া চাপরাশী আসি কহিল সাহেবে।
বাক্যছন্ধ বন্ধ ভাবি মনে মনে ভাবে ॥
তিলেক না তিষ্টেন তথা আইল স্বস্থানে।
হুকুম রদুল অনুমানি মনে মনে ॥
সত্য ছোট মহারাজ বাহাদুর না হইলে।
জজ মেজেষ্টরকে এমত কেবা বলে ॥
য এব লোকঃ স এব ধর্ম্মঃ মিথ্যা তাকি হয়।
বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিল নিশ্চয় ॥
মনে মনে পরাণের ভয় উপজিল।
নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥
জানিলেন অন্তর্য্যামী পরাণের অন্তর।
নিশাভাগে রাত্রিযোগে হইয়া সত্বর।
বিষ্ণুপুর গড় মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
কিয়ৎকাল রহি সান্তাইব বাহুক্লেশ ॥

বিষ্ণুপুরে গমন।

ধীরাজের ছত্রধারী মল্লাবলি নাথ।
আতিথ্য স্বীকার করি তারে অকস্মাৎ ॥
স্বপ্নসম জানাইতে পাইয়া চেতন।
সত্বরে আসিয়া রূপ করি দরশন ॥
সেবার আলয়ে সেবা নিযুক্ত করিয়া।
পরিচয়ে পরিচয় মাগিল আসিয়া ॥
অলক্ষ্য সাহা ফকির বলি দেন পরিচয়।
শুনিয়া রাজার মন না হয় প্রত্যয় ॥

ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্র মনে হয়।
করেন তঞ্চক রাজার হইল সংশয়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভঙ্গিতে হইল মন।
জল মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন অনুক্ষণ।
মহাহ্রদ গম্ভীর জল দহ যারে কয়।
স্নান ছলে সেই জলে নামাই আশয়॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া হরি চলি যাই তথা।
দহ মধ্যে ডুবিলেন শুন তার কথা॥
প্রহর পর্য্যন্ত ডুবি থাকিলেন হরি।
রাজা আদি সব লোক হাহাকার করি॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিয়া অন্তর।
দহ হইতে উঠিলেন জগৎ ঈশ্বর॥
যে হয়েন সে হয়েন সেবা করিব চরণ।
গোপালচন্দ্র মহারাজার এই হইল মন॥
বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ কহয়ে বচন।
প্রতাপচন্দ্র মহারাজা বটেন এই জন॥
কপট পরিচয় দেওয়া বুঝিল অন্তর।
ভক্তিভাবে কিন্তু সেই সেবাতে তৎপর॥
বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ময়।
জনবর কলরব হইল অতিশয়॥
পরস্পর পরাণচন্দ্র করিয়া বিচার।
বাঁকুড়ার মেজেষ্টরের করয়ে দরবার॥
দিবানিশি মনে মনে রচিয়া মন্ত্রণা।
না থাকেন সন্ন্যাসী দেশে করিল প্রার্থনা॥
স্বয়ং মেজেষ্টর বিষ্ণুপুরেতে পয়ান।
আপন নজরে দেখে কত ভঙ্গিয়ান॥
পরিচয় মাগিতে কহেন পরিচয়।
অলক্ষ্য সাহা ফকির আমি ফিরি নিরাশ্রয়॥
যেখানে পিরিতি পাই যাই সেই স্থান।
সন্ন্যাসী প্রকৃতি এই কর অনুমান॥

তর্জ্জন গর্জ্জন কত করে মেজেষ্টর।
নির্ভয় শরীর যার তার কারে ডর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কথা আমান্য করিয়া।
মোনী হইয়া থাকিলেন আসনে বসিয়া॥
দারগায় মদদ রাখি করিয়া পয়াণ।
নিজতক্তে বসিয়া করেন অনুমান॥
পরাণচন্দ্র বাবুর চাকর মোক্তিয়ার।
মেজেষ্টর তাহার স্থানে লইয়া ইজাহার॥
যাহাতে সন্ন্যাসী জেলায় থাকিতে না পায়।
ইজাহার উপলক্ষে কৌশলে জানায়॥
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যাইতে জেলান্তর।
অচিরাৎ পরোয়ানা হইল সাদর॥
দারোগা মারফতে করে পরোয়ানা জারি।
শোকে বিষ্ণুপুর মগ্ন হইল যে ভারি॥
ত্যজিল আহার নিদ্রা নিরানন্দ সবে।
ব্রজনাথ মথুরা গমন যেন হইবে॥
তথি মধ্যে দেখ এক খেলার তরঙ্গ।
গবর্ণর কৌন্সিলে কথা হইল প্রসঙ্গ॥
অকস্মাৎ ইংরাজী চিঠি কেবা করে জারি।
শ্রুতমাত্র কৌন্সিলেরা যথার্থ বিচারি॥
পূর্ব্ব পরোয়ানা পরিবর্ত্তে পরোয়ানা।
ইচ্ছামত থাকিবেন কে করিবে মানা॥
তৃতীয় দিবস মধ্যে জারি আচম্বিত।
বিষ্ণুপুরবাসী যত শুনি চমকিত॥
কেহ কহে কেহ যদি সন্ন্যাসী অতীত।
এত কি ক্ষমতা ধরে দরবার শাসিত॥
আরত সন্ন্যাসী আইসেন হাজারে হাজার।
এত ক্ষমতাপন্ন কোথা দেখ আর॥
প্রত্যক্ষ অনুমান সিদ্ধান্ত মানি।
নিশ্চয় জানিও প্রতাপচন্দ্র বটেন ইনি॥

পূর্ব্বপরিচিত চিহ্ন যথার্থ বিচারে।
সত্য প্রতাপচন্দ্র বিনা অন্য কেবা পারে॥
নিরাপদে চতুর্ম্মাস তথায় বিরাজ।
* * *

কারাবাস।

বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপচাঁদ জামকুরি নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহার অনুচরগণ ইতঃপূর্ব্বে আসিয়া জুটিয়াছিল। সেখান হইতে কাশীপুর নামকস্থানে যান। তথাকার রাজা গৌরনারায়ণ * তাঁহার খুব যত্ন করেন। তাহার পর প্রতাপচাঁদ স্বদলে বাঁকুড়া যাত্রা করেন।

স্বরূপাঙ্গ করি রঙ্গ লিখি পরিচয়।
যাহাতে ম্লেচ্ছ কর্ম্মকারক প্রত্যয়॥
ম্লেচ্ছ জান্দরেল মানভূমে করি থানা।
তাহার নিকটে পত্রী করেন রওনা॥
লিপিতে বিশেষ জানি না করে নিষেধ।
নিজধাম যাইতে বিধি তাহে নাহি জেদ॥
পদাতিক সহ সঙ্গে স্বরূপাঙ্গ চলি।
শিবিকা বাহনেতে মনের কুতূহলী॥
রাণীদত্ত শিবিকার রূপ আরোহণ।
ক্রমে ক্রমে চলিলেন বন উপবন॥
চলে পদাতিক করি লঙ্গা তলোয়ার।
কি হইবে সম্মুখ জিবে দেখি চমৎকার॥
বাকুন্দা সহর মধ্যে যেই উপনীত।
লাঙ্গা হাতি দেখি দারোগা কম্পিত॥
ম্লেচ্ছ হাকিম হুদ্দা নিষেধিতে ভার।
অবিচার কর্ম্ম জানি হয়ে হুসিয়ার॥
ফাটকে আটক করি করিল মন্ত্রণা।
আগে সরি যাইয়া চলিতে করে মানা॥

* সঞ্জীব বাবু বলেন রাজা জয়সিংহ।

স্বরূপাঙ্গ শুনিলেন এতেক কাহিনী।
ঈষৎ ক্রোধ হয় উপরোধ নাহি মানি॥
প্রাণভয়ে দারোগা নাজির বরাবর।
সবিশেষ সমাচার কহে সরাসর॥
নাজির প্রতিবন্ধ হয় তাহা না মানিয়া।
দোষহীন চলি যান লোক জানাইয়া॥
নাজির সংবাদ মেজেষ্টরে জানাইল।
শ্রুতমাত্র হয় আরোহণে আগাইল॥
ম্লেচ্ছো দেখিয়া স্বরূপাঙ্গ ক্রোধ করি।
শুনিয়া না শুনিয়া গমন ত্বরাত্বরি॥
রঘুন হুমুক দেখি চলি মেজেষ্টর।
পল্টনের কাপ্তেনে জানায় সত্বর॥
লইয়া পল্টন এক কম্প তথা হইতে।
মোকাম বেলগুমি আসি ঘেরিল রাত্রিতে॥
সেনার শৈথিল্য তথি অলস সময়।
ধর মার শব্দ বিনা আন কথা না কয়॥
ইচ্ছাতে ইচ্ছুক হরি কে করে খণ্ডন।
করি সাধন হলেন ম্লেচ্ছ বন্ধন॥
যুগাদি মাসের চতুর্বিংশতি দিবসে।
বন্ধন স্বীকার করেন ম্লেচ্ছ নিবাসে॥
তথায় পরাণ চন্দ্র বাবুর মোক্তিয়ার।
ত্বরা করি লিখিয়া পাঠায় সমাচার॥
পত্র পাঠে হ'য়ে ব্যস্ত করিয়া মন্ত্রণা।
প্রত্যুত্তর পত্র মধ্যে লিখিল বাসনা॥
বিংশতি সহস্র মুদ্রা হস্তীর উপরে।
অবিলম্বে পাঠায় নজর মেজেষ্টরে।
বশীভূত অর্থেতে বসন্ত লাল বাবু।
পূর্ব্বমায়া ত্যজি হতবুদ্ধি হয় কাবু॥
গোপীদত্ত রাঘব ভঞ্জ জীব পশুবৎ।
সত্য মিথ্যা করিবারে সভে এক মত॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৫ম খণ্ড] পৌষ, ১৩১১। [১ম সংখ্যা।

সিংহলে ইংরেজ।

পুরাকালে সিংহল যে অতীব সমৃদ্ধিশালী বহু জনসমাকীর্ণ সাম্রাজ্য ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। বৃহৎ নগর সমূহের ধ্বংসাবশেষ, ত্রিন্‌কোমালীর সন্নিহিত কাঙ্গিলির কৃত্রিম হ্রদ, ও বিবিধ লোক হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের চিহ্নাদি পরিদৃষ্টে সিংহলবাসীদের পূর্ব্ব বৈভব ও সম্পৎ সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন রাজধানী অনরাজপুরের ন্যায় বৃহদায়তন নগরী তৎসময়ে অতি অল্পই ছিল। আরব জাতির ইতিহাসে ও উপন্যাসে এই ধন-রত্ন শস্য সৌন্দর্য্য সম্পন্ন সিংহলের ভূয়সী প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয় *। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহলবাসীগণ ভারতবর্ষ, চীন, আরব, মিশর প্রভৃতি অনেক দেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া এসিয়াখণ্ডে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সিংহলের এই ঐশ্বর্য্যই তাহার কাল হইল। চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ লোলুপ নৌ-দস্যুদিগের আক্রমণে সিংহল জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

* সিংহলের আরব পর্য্যটকদিগের প্রদত্ত নাম, 'সেরেন্দিল'। পর্য্যটক Marco Polo সিংহল দ্বীপকে "the first in the world" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন।

মহতের এই নীত সবার করিতে হিত
সাশ্রুরীত (?) করিল সদনে ॥
ইথে ধর কিবা দোষ, কি করিলাম অপৌরুষ
কেন রোষ করি অবিচার।
সত্য কোথা মিথ্যা হয় অধর্ম্মের নাহি জয়
কি সংশয় হও শান্তি তার ॥
তেজশ্চন্দ্র মহারাজ ধীরাজ জগমাঝ
এ কি লাজ সে জন সন্তানে।
করিলে যে অপমান বিচারে ক্ষওয়াবে মান
যার মান যাবে তার স্থানে ॥
এত কহি ক্ষেত্রমোহন সিংহ চলিলেন।
রূপ স্বরূপাঙ্গ সাক্ষাতে দেখিলেন ॥
মন মত মেজেষ্টর না শুনিয়া বোল।
নজরবন্দী থাকিতে হুকুম উত্তরোল ॥
হাকিমান হুকুম রদুল করে কেবা।
সহজে আটক হরি ঘটাইলেন যেবা ॥
* * * *

হুগলি গমন।

বাঁকুড়ায় বন্দী রূপ সহ স্বরূপাঙ্গ।
তথি মধ্যে দৈবযোগ দেখনা তরঙ্গা ॥
সদর কৌঞ্জল হতে আইল পরোয়ানা।
বাকুন্দার মেজেষ্টরে তম্বি করি নানা ॥
হুগলি আসন মধ্যে হইবে বিচার।
যতনে প্রতাপচন্দ্রে পাঠাইতে ভার ॥
চৈত্র মাস রহি তথা হুগলি গমন।
বাকুন্দায় স্বরূপাঙ্গ করিল বন্ধন ॥

মহা হুল স্থুল।

হুগলিতে হুলস্থুল ঘটে দরবার।
বিনা আহ্বানে আইসে নানা সহকার ॥

মিলিলেন বিভীষণ অংশ অবতার।
ম্লেচ্ছকুলেতে সে গিরিল নাম যার ॥
সাহা * সাহেব বলিয়া নাম সুগ্রীব সোসর।
লুটিস নীল বেনট নল যার অনুচর ॥
সুরীত শ্রীনাথ বাবু অতি প্রিয়তম।
পূর্ব্ব পরিচিত জন এবে আছে ভ্রম ॥
কুবের যক্ষেশ্বর ধনের ঈশ্বর।
রাধাকৃষ্ণ বসাক বাবু তাহার কিঙ্কর ॥
ততোধিক জয়গোপাল পরিবার।
দিয়া ধন তোষে মন এত শক্তি যার ॥
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র পবিত্র সে জন।
পরহিতকারী এত তথির কারণ ॥
আর কত লোকে কত যোগাইল ডালি।
সহর কলিকাতা হদ্দ চুঁচুড়া হুগলি ॥
হইল রূপের মেলা আলো ত্রিভুবন।
দরশন করণে লোক পাশরে আপন ॥
ইথে সসিয়ান জজ করি অবিচার।
বর্ষ এক আটক ফাটকে অবিচার ॥
চল্লিশ সহস্র মুদ্রা, মেয়াদের পর।
তাইন জামিন হইলে পর অবসর ॥
প্রতাপচন্দ্র প্রতি এই হুকুম সাদর।
স্বরূপাঙ্গ প্রতি হুকুম হয় স্বতন্তর ॥
বর্ষ এক মেয়াদ বাদ হইলে জামিন।
দশ সহস্র মুদ্রা করি তাহার তাইন ॥
হইবেন তবে অবসর স্বরূপাঙ্গ।
ম্লেচ্ছ অবিচার সংপ্রতি হয় সাঙ্গ ॥

* W. D. Shaw.

ইয়ুনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ও

ভারতীয় শিক্ষা।

ভারতবর্ষের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে আমরা যে সমস্ত সুবিধা এবং সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপর সাধারণ সকলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার চেষ্টা এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতাকেই আমরা সে সকলের মধ্যে মুখ্যতম বলিতে পারি। প্রাচীন ভারতে কি ছিল, তাহার সহিত তুলনায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে সব আলোচনার প্রয়োজন নাই, সে প্রাচীন স্মৃতির চিতাভস্ম লইয়া চিন্তা করিয়া সুখ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে ইংরেজ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশে শিক্ষার বিস্তৃতির সহিত বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার বিস্তৃতির তুলনা হয় না। তখনকার শিক্ষা এবং তদ্বিষয়ে সুবিধার সহিত এখনকার শিক্ষা সুবিধার তুলনা হইতেই পারে না। মাতৃভাষার উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেই যুগের বঙ্গভাষাও এই যুগের বঙ্গভাষার মধ্যে কতদূর পার্থক্য! এ যুগের বঙ্গ-ভাষা তদপেক্ষা কত দূর উন্নত! এই উন্নতির মুলে যে ইয়ুরোপীয় শিক্ষা-প্রণালীর কৃতকার্য্যতা বিশেষরূপে বর্ত্তমান, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা ইংরাজি পড়িয়া মাতৃভাষাকে আদর করিতে শিখিতেছি, তাহার শোভা সম্পত্তি এবং অনুকরণ বিষয়ে যত্নবান হইতেছি,—ইংরাজিই আমাদিগকে সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, ইংরাজির সাহায্যেই আমরা সেই ভাণ্ডার হইতে শত শত অমূল্য মণি মাণিক্য আহরণ পূর্ব্বক মাতৃভাষার বরবপুঃ সজ্জিত করিতেছি; এবং বৈদেশিক ভাণ্ডার হইতেও রত্নান্বেষণ এবং আহরণ শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং ইংরাজি ভাষার এবং শিক্ষা-প্রণালীর নিকট আমরা যে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, তাহা আর বলিতে হইবে না। ইংরাজি শিক্ষা ভাল অথবা সংস্কৃত শিক্ষা ভাল, ইংরাজিতে আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান খর্ব্ব করিতেছে কি না, আমরা সে সমস্ত আলোচনা করিতে চাহি না। কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তদ্বারা আর্থিক, মানসিক অনেক প্রকারের উপকারের ও সুবিধার আশা আমাদের বিশেষরূপেই বর্ত্তমান

আছে; সুতরাং ইংরাজি উচ্চশিক্ষার প্রচলন যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে আমরা একান্ত উৎসুক এবং সচেষ্ট। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও এপর্য্যন্ত আমাদের সেই আশা পরিপূরণ কল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সময় সময় আবশ্যক মত উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এডুকেশন কমিশন, এডুকেশন ডিস্‌প্যাচ্‌ ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের সেই ইচ্ছার ফল। এই সব তদ্বির তদারকে এপর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা ক্রমশঃই দেশ মধ্যে বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া আসিতেছে এবং তদ্বারা দেশের দরিদ্র পল্লীবাসিগণের যে কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। দেশীয় সদাশয় অনেক ব্যক্তি এই শিক্ষার উন্নতি-কল্পের সহায়তা করিতেছেন; অনেকে আবশ্যকীয় স্থল সমূহে বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেরাও স্বীয় স্বীয় সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অন্নবস্ত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতা হ্রাস করিয়াও মাসিক চাঁদা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন; সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইতে এই সব বিদ্যালয়ের উন্নতি, স্থায়িত্ব শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি কল্পে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং পিতা যেমন সন্তানের স্বীয় ক্ষমতায় দণ্ডায়মান ও ভ্রমণের চেষ্টাকে আনন্দপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন এবং প্রতি পদে স্বীয় সবল হস্ত তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া তাহাকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেন, গবর্ণমেণ্টও ঠিক সেইরূপ ভাবে এই সব বিদ্যালয়কে উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন সে জন্য আপামর সাধারণ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সম্প্রতি গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের নিয়োগক্রমে যে এক বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন দেশীয় উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ কল্পে বসিয়াছিল, তাঁহারা তদ্বিষয়ে যে রিপোর্ট জাহির করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ভারতীয় সকলেই বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। যদি ঐ কমিশনের পরামর্শ মত শিক্ষা-বিষয়ক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ধনী সন্তান ব্যতীত মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রাবস্থার লোকদিগের পক্ষে সন্তানগণের উচ্চশিক্ষা প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

দেশীয় সকল সংবাদ পত্রেই এবিষয় লইয়া তুমূল আন্দোলন চলিয়াছে। প্রবীণ সুযোগ্য সহযোগী বেঙ্গলী পত্র ঐ রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বেই কোন সূত্রে উহার আভ্যন্তরিক বিষয় অবগত হইয়া আসন্ন বিপদের বার্ত্তা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাপন করেন এবং তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আন্দোলন করিতে থাকেন; তারপর দেশীয় লোকদিগের ব্যগ্রতায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। এখন সকলেই ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলে ভারত-সভার পক্ষ হইতে রাজা প্যারামোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বৃহতী সভায় উহার আলোচনা হইয়াছে। সে সভায় অনেক বড় বড় বক্তা উপস্থিত ছিলেন। সভা হইতে কমিশনের প্রতিবাদ করিয়া এক দরখাস্ত বড়লাট সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। উপাধিধারীগণও সিনেট হলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা করিয়া এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের বঙ্গের গৌরবরবি সুসন্তান মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ঐ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কমিশনের অধিকাংশ সভ্যগণের কতকগুলি মতে একমত হইতে না পারিয়া পৃথক মন্তব্য দাখিল করিয়াছেন। যে সমস্ত পরামর্শ গ্রাহ্য হইলে দেশে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইবে, পূজনীয় গুরুদাস বাবু সে সবগুলিই স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় বিচার পূর্ব্বক সুন্দর-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ইহাই আশা করি। তাঁহার মত ধার্ম্মিক, স্বদেশ প্রেমী ইহা ভিন্ন আর কোন্ পথ অবলম্বন করিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার এই স্বাভাবিক চরিত্র ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসাবাদ বা ধন্যবাদ আর কি করিব?

আমাদের 'বীরভূমি' দেশের সেবক; শিক্ষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক। এজন্য আমরাও অতি সংক্ষেপে বর্ত্তমানে এবিষয় একটু আলোচনা করিব; আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের যে ইহার সহিত বিশেষ স্বার্থসম্বন্ধ জড়িত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কমিশন অনেক কথাই বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে কয়টি প্রধান আলোচ্য তাহা এইঃ—

১। যে সব বিদ্যালয়ে কেবল এল্, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়, সে সমস্তকে হয় বি, এ, শ্রেণী খুলিতে হইবে, না হয় এণ্ট্রান্সে নামিতে হইবে। হরিশ-

চন্দ্রের মত অথবা ত্রিশঙ্কুরমত অন্তরালে থাকিতে পাইবে না। ইহাদের এইরূপ দুই নৌকায় পা দিয়া থাকাতে নাকি বড় ক্ষতি হয়!

২। শিক্ষাবিধানের সৌকর্য্যার্থে বেতনের হার বেশ চড়াইয়া দিতে হইবে; অল্প বেতনের শিক্ষা অল্প হয়, সুবিধার হয় না; বেশী ছেলে ভর্ত্তি হইয়া একটা হট্টগোল হয়, বেশী বেতনের হার হইলে কলেজ শ্রেণীতে গরীবের ছেলেরা—যাহাদের তেমন কুশাগ্রধী নহে, বৃথা পয়সা খরচ করিতে আসিবেনা। যাহারা বুঝিতে সক্ষম, শিক্ষার ফল দেখাইতে সক্ষম, তাহারাই আসিবে। ইহাতে যদিও শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু কম হইবে, কিন্তু শিক্ষার বনিয়াদ পাকা হইবে, শিক্ষা ভাল হইবে।

৩। আইনের কলেজ সরকারী তত্ত্বাবধনে আনিতে হইবে। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় আইন বিদ্যালয় হইবে; আর সব উঠাইয়া দিতে হইবে।

৪। কলেজ প্রভৃতিতে যে আয় হয়, তাহা সত্বাধিকারী লইতে পারিবেন না।

৫। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কোন ইংরাজি পাঠ্য বই থাকিবে না; এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্কুলে শেষ পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহাতে যাহারা পাশ হইবে, তাহারাই এণ্ট্রান্স দিতে পারিবে। পরীক্ষার পাশের নম্বর বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। এণ্ট্রান্স স্কুল য়ুনিভার্সিটি ভুক্ত করিতে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীর সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে, সকল স্কুলই সব বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের অধীন থাকিবে।

৬। কলেজ সমুহের বন্দোবস্ত ভাল করিতে হইবে, শিক্ষার সুবিধার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন প্রয়োজন, কলেজ সমূহকে তাহা সমস্তই করিতে হইবে। বালকগণের নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতিরও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইত্যাদি।

কমিশন অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কয়েকটি আমরা লিখিলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে যুবক ও বালকগণের পক্ষে হিতকর, সে বিষয় সন্দেহ নাই, আমাদেরও তাহাতে অন্যমত নাই। বালকগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যবিধানের জন্য কমিশন যাহা সব বলিয়াছেন, তাহা আমরাও অনুমোদন করি। তাহাদের নৈতিক উন্নতি, পাঠের ও জ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষা সহবৎ, আচার ব্যবহার, তরিবৎ ইত্যাদির উন্নতি প্রভৃতির বিষয় আমারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি,

কমিশনের পরামর্শ ও আমরা বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিব। পরীক্ষার কঠোরতা আর কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, যাহাতে বালকগণ মুখস্থ বিদ্যা সম্বল করিয়া পাশ না করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করে, সে উপায় করা হয়, তাহাতেও আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট। কিন্তু আদৎ গলদ্ গোড়ায়। কমিশন উচ্চ শিক্ষা বৃদ্ধিকল্পে যে কলেজের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, এফ, এ, কলেজ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন, বেতনের একটা নিম্নহার সরকার তরফ হইতে বাঁধিয়া দিতে বলিতেছেন, আইন কলেজ সব উঠাইয়া দিতে বলিতেছেন, এই সব বিষয়েই আমাদের আপত্তি এবং দেশের সর্ব্বসাধারণেরই আপত্তি।

এফ্, এ, কলেজ গুলি দ্বারা যে দেশের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ হইবার নহে। অনেক দরিদ্র সন্তান অল্প খরচে এই সব কলেজের কৃপায় এফ্, এ, পাশ করিয়া উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই সব কলেজের দ্বারায় উচ্চ শিক্ষার কোন ক্ষতি হইতেছে, তাহাত কেহই বলিতে সাহস করেন নাই, আর আমরাও সেরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাই নাই। স্বীকার করি, অনেক এফ্, এ কলেজে উপযুক্ত পুস্তকাবলী, যন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তাহাদের শিক্ষা দেওয়ায় অনেক ত্রুটী আছে, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলাটা সুযুক্তি বলিয়া আমরা বলিতে পারি না। তাহাদের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তাহারা ভাল সাজ সরঞ্জাম, শিক্ষার উপযোগী বিষয় সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তাহাতে বাধ্য করা হউক, সে জন্য কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু তাহাও বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সাজ সরঞ্জামের সমতুল্য সাজ সরঞ্জাম মফস্বলের কলেজ সমূহের পক্ষে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাহা না হইলে নয় এইরূপ বিষয় সমূহে তাহাদিগকে বাধ্য করা হউক, এই কথা আমরা বলিতে পারি। যাহাদের সেরূপ সামর্থ্য আছে, তাহারা তাহা করিবে, যাহাদের নাই, তাহারা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। ইয়ুনিভার্সিটি উপযুক্ত লোক পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া এই সব কলেজ মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা বেশ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মন্তব্য অনুসারে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহা না করিয়া, তাহারা বি, এ, হইতে পারিবে না, এই কারণে তাহাদের মৃত্যু ব্যবস্থা করা কোন ক্রমেই সমীচীন

নহে। তাহারা যেরূপ আছে, সেই পদে তাহারা উপযুক্ততার সহিত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদে উঠিবার যোগ্যতার অভাব বশতঃ তাহাদিগকে পেষণ করিয়া মারিয়া ফেলা কিরূপ যুক্তি, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাহারা যে বিশেষ খারাপ ফল দেখাইতেছ তাহাও প্রমানিত হয় না। এরূপক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি এই নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু অনেক গরীব ভদ্রলোকের ছেলে পিলের কলেজ প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইবে, অনেকের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কষ্টজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কলেজ দ্বারা যে মফস্বলের গরীব ভদ্রলোকদিগের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কমিশন বলিতেছেন যে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর হইলেই থাকিতে পারিবে, তাহার মধ্যেও কথা উঠিতে পারে যে, প্রথম শ্রেণীর হইলে যে তাহাদের সময়, দোষ দূর হইয়া যাইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? তাহা হইলেই যে ভালরূপ যন্ত্র-তন্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম করিবে, ভাল লোক রাখিবে, তাহার অর্থ কি? সে জন্যও তো বিশ্ব বিদ্যালয়কে পরিদর্শক রাখিতে হইবে, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে! সে পরিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ এখনও ২য়, শ্রেণীর উপর করিলে কি ক্ষতি হইবে, আমরা বুঝিতে অক্ষম।

তারপর বিদ্যালয় সমূহের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিষয়ে আমাদের প্রধান আপত্তি। কমিশনের যুক্তি এই যে, অল্প বেতনের হার করিয়া অনেক কলেজ অধ্যক্ষ কেবল ছেলে বাড়াইবার দিকে চেষ্টা করেন। শিক্ষা প্রণালীর সৌকর্য্যাদি বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দেন না; সরকার হইতে বেতনের একটা নিম্ন হার বাঁধিয়া দিলে এরূপ হইতে পারিবে না। আরও কথা এই যে অল্প বেতনের জন্য অনেক গরীব অল্প মেধাবী বালক কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়, তাহারা তেমন শিক্ষা লাভও করিতে পারে না, অথচ ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। এ যুক্তিরও বিশেষ সারবত্তা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে উপলব্ধি হয় না। কলেজের অধ্যক্ষগণ বেতন সম্বন্ধে কি করেন না করেন, সরকার বাহাদুরের তাহা দেখিবার বিশেষ অবশ্যকতা কি? তাঁহার যখন সরকারী সাহায্যপ্রার্থী নহেন, তখন সে বিষয় তাঁহারা যেমন ইচ্ছা করুন, বিশ্ববিদ্যালয় রীতিমত আইনকানুন করিয়া একটা নির্দ্দেশ করুন যে, প্রত্যেক কলেজকে এইরূপ সব বন্দোস্ত রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তো হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ যাহা চাহেন, সেরূপ ভাবে সব আছে কিনা, হইতেছে কিনা, তাহা দেখুন পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান করুন, তাহার পর যাহা উদ্ধৃত হয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহা ইচ্ছা তাই করুন ; তাহাতে কি আপত্তি ?

দরিদ্র বালকগণ অল্প মেধাবী বলিয়া তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে না, এটাও বড়ই একদেশদর্শিতা। যাহারা অল্প মেধাবী অথচ পরিশ্রমী, তাহারা একবার না হউক, দুই বারে কি তিন বারে উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, এরূপ প্রমাণ আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত। চেষ্টার দ্বারা পুরুষাকারের প্রবল প্রভাবে মানুষ অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকে। আমরা এরূপ লোকের বিষয়ও জানি যে, প্রবেশিকায় অতিমন্দ বালক বলিয়া পরিগণিত ছিল, অঙ্ক-শাস্ত্রে কিছু মাত্র পারদর্শিতাছিল না, প্রধান শিক্ষক তাহাকে পড়িতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রবেশিকা কোনরূপে পাশ করিয়া বিশেষ চেষ্টাদ্বারা অঙ্ক শাস্ত্রে এরূপ দক্ষতা দুই বৎসর মধ্যে লাভ করিয়াছিল যে, দ্বিতীয় বিভাগে এফ্. এ পাশ করিয়াছিল এবং অঙ্ক শাস্ত্রে তাহার ১ম বিভাগোপযোগী নম্বর ছিল। সুতরাং কাহার মেধা কোন সময় কি ভাবে খুলিবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। এরূপ স্থলে একটা উচ্চ ধরণের বেতনের হার করিয়া দিয়া দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার পথরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। দরিদ্রগণের মধ্য হইতেই প্রায়শঃ মনীষীগণের উদ্ভব হয়, ইহা একটা চলিত কথা। দেশের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে অধিক মন্দ হইতেছ, লোকের অর্থকৃচ্ছতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ; এরূপ স্থলে বেতনের বৃদ্ধি প্রস্তাব উত্থাপিত করা কোন ক্রমেই অনুকূল বোধ হয় না। তাহা হইলে অনেকেরই বড় বেশী কষ্ট হইবে। আমরা জানি, অনেক পিতা স্বীয় আহার বিহারে অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্তানের পাঠের খরচ যোগাইয়া থাকেন, কমি-শন একবার বিবেচনা করিবেন, এরূপ লোকদিগের দশা নবীন নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে কিরূপে হইবে। এবিষয় আমরা আর বেশী আলোচনা কি করিব। একজন দরিদ্র বলিয়া সে উচ্চ শিক্ষা পাইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা কি সঙ্গত ?

কমিশন উপযুক্ত দরিদ্রদিগের জন্য বৃত্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ; অনেক প্রকার বাধা বিঘ্নে তাহা প্রতিহত হইবে, তাহারও অনেক প্রকার অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে। তদপেক্ষা ও বিষয় ছাড়িয়া দিলেই কোন গোল নাই। ছাত্রগণ অর্থপুস্তক

সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি মুখস্ত করিয়া পাশ হইয়া যায়, একথা অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ। আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, একথা যথার্থ, কিন্তু সে জন্য ছাত্রগণকে দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল-বিভাগের ছাত্রগণের কথাই ধরুন :—তাহারা যে ইংরাজি সাহিত্য পুস্তক পাঠ করে, তাহার অনেক স্থল তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের তুলনায় বড় বেশী কঠিন। তাহার ভাব আয়ত্ত করা ও তাহা স্বীয় ক্ষমতায় প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। De Quinc র এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি নানা সমাসালঙ্কার ভূষিত পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অথবা Smiles এর গম্ভীরপদা সরস্বতীর অর্থগৌরব উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে বড় সহজ নহে ; প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ করাইয়া দিতে শিক্ষকের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যায়, তথাপি যেন বোধ হয় বালক বুঝিতে পারিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে মুখস্ত করিতে হয়। ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক এত যে তাহাদের অনেকের ভাষাও এরূপ যে, সমস্ত পুস্তক বুঝিয়া পড়িয়া শেষ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা সংক্ষিপ্ত সারকেই সার করিতে বাধ্য হয় ; শিক্ষককেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিতে হয়। পাঠ্য পুস্তকের ঔৎকর্ষ, পরীক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রভৃতির দিকে মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে এসব বিষয়ের অনেক উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমরা ভরসা করি। ইতিহাস প্রভৃতির ইংরাজি যাহাতে অতি সহজ হয়, সেরূপ ভাবে পুস্তক নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরাজির পাশ নম্বর আর একটু বেশী হউক, আমরা তাহাতে আপত্তি করি না, এবং আহ্লাদিত চিত্তেই সম্মতি দিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনেও যেন অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এবং প্রশ্ন করিতেও যেন সেইরূপ ভাবে প্রশ্ন করা হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী এই যেন বিবেচনা করা হয়। সে ভাষা বিজ্ঞান, ধাতু তত্ত্ব প্রভৃতি অধীয়ান নহে, তাহা যেন স্মরণ থাকে। এণ্ট্রান্সস্কুল বিশ্ব-বিদ্যালয় ভুক্ত করিতে হইলে এখনও ইনস্পেক্টর বাহাদুরের মত না লইয়া আর হয় না সুতরাং সে বিষয় আরও বাঁধাবাধি নিয়ম করিয়া কড়াকড়ি করিবার কি আবশ্যকতা, আমরা বুঝি না। যাহা আছে, ইহাতে যদি ভাল কাজ না হয় তবে নবীন প্রথায়ই যে হইবে তাহা বোধ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি কেবল নিয়ম প্রণয়নে ব্যস্ত না থাকিয়া তাহাদের

পালিত হওয়ায় বিষয়েও বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কাজ ভাল হইতে পারে। শুধু নিয়ম বন্ধনেই কি ফল হইতে পারে?

গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্কুল শেষ পরীক্ষার প্রবর্ত্তনে বিশেষ কি লাভ আর তাহার আবশ্যকতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। বিশেষতঃ আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত সুতরাং আপাততঃ আমাদের এখানেই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আবশ্যক বোধ করিলে অবসর ক্রমে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। এই সকল নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে দেশের সকল বড় লোকেই প্রতিবাদ করিতেছেন এবং আমরা বিশেষ ভরসা করি, সদাশয় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর দেশের এত লোকের আবেদনে উপেক্ষা করিবেন না। * উপসংহারে আমরা এক বিষয়ে কমিশনকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তাঁহারা দেশীয় ভাষাকে আরও প্রসর দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য সেবী দরিদ্র, আমাদের মাতৃভাষার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর দেখিলে আমরা বড়ই সুখী হইব। ইতি ১৩০৯ সাল ২২শে ভাদ্র।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুমূর্ষু-কৃত্যে শোকাপনোদন। †

যে কালের প্রতীক্ষায় আর্যগণ ধর্ম্মব্রতে ব্রতী থাকিয়া আনন্দে সমস্ত জীবন উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন; যে পুণ্যরাজ্যের প্রজা হইবার মানসে আর্য্যগণের ঐহিক সমস্ত কর্ম্মস্রোত একই ধারার প্রবাহিত হইতে; যে লোক উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এই দৈহিক বিকার সকল আর ভোগ করিতে হয় না; যথায় রোগ নাই, শোক নাই, জড়শক্তির বিভীষিকা

* এই প্রবন্ধ প্রেসে প্রেরিত হওয়ার পর, এ সম্বন্ধে লাট সাহেবের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক যে সকল বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, লাটসাহেবও তাহার অনেক গুলিতে আপত্তি করিয়াছেন। বীঃ সঃ—

† এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বিদ্যানন্দ প্রণীত "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। লেখক কেবল স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র।

নাই, ইচ্ছার প্রতিঘাত নাই—বাদ, বিসম্বাদ, অন্যায়, অধর্ম্ম, কিছুই নাই; পরন্তু যথায় লোকে স্বকৃত ধর্ম্মোন্নতি অনুসারে উন্নত হইয়া জ্ঞানানন্দে, প্রেমানন্দে—সর্ব্বানন্দে অনুপম সুখসম্ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে; যে দিন এই কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যধাম (ভারতবর্ষ) ত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যলোকে যাত্রা করিতে হইবে; আর্য্যগণ সেই মহাপ্রয়াণের দিনকে ইহজীবনের মধ্যে পরম পুণ্যকাল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, দেশাদেশ ও পাত্রাপাত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই আর্য্যগণ ইহজীবনে পুণ্যকার্য্যের অবসর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষের সেই দিন এতই পুণ্যকাল যে, সে দিনে আর্য্যগণ বহির্জ্জগতের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

"পুণ্যকালাস্তদা সর্ব্বে যদা মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
তদা গোভূহিরণ্যাদি দত্তম ক্ষয়তামিয়াৎ॥"

গোদান, ভূমিদান, হিরণ্যদান—সর্ব্বস্বদান করিয়াও চিত্তভার লাঘব করিবার জন্য সেই দিন আর্য্যগণের মন স্বতঃপ্রেরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই দিনেই যথার্থ বৈরাগ্য ভাব হৃদয়ে দেখা দিয়া থাকে; এবং সেই দিনই সংসারের বিষয়, আশায়, ধন, মান, সকলেরই যথার্থ ছবি অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয়। সেই সর্ব্বস্বত্যাগের দিন যখন উপস্থিত হইবে, তখন মমতার গ্রন্থি সকল একে একে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিবে। মানব কালচক্রে ভ্রাম্যমান হইয়া ইহসংসারে চিরদিনই যে মমতার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন; প্রবৃত্তিসমূহকে যে জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বোধে তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন ক্ষেপণ করিয়াছিল, যখন সেই মমতা—সেই প্রবৃত্তি সমূহের আবাসভূমি এই দেহ করাল কালের প্রবল বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিবে, তখম এই কর্ম্মভূমিতে মঙ্গল কার্য্যের জন্য যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, তাহাই ব্যগ্রচিত্তে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

"বন্ধুপুত্রকলত্রাদি ক্ষেত্রধান্যধনাদিষু।
মিত্রবর্গে চ দৈত্যেন্দ্র মমত্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥
মিত্রানমিত্রান্ মধ্যস্থান্ পরান্ স্বংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থনোপচারেণ ক্ষাময়েৎ স্বকৃতং স্মরণ॥

তত্ত্বং প্রযতঃ কুর্য্যাং উৎসর্গং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শুভাশুভানাং দৈত্যেন্দ্র বাক্য চেদমুদাহরেৎ॥

* * *

ন মেঽস্তি বান্ধবঃ কশ্চিৎ বিষ্ণুমেকং জগদ্‌গুরুম্।
মিত্রপক্ষে চ মে বিষ্ণুরধশ্চোর্দ্ধং তথাগ্রতঃ॥
পার্শ্বতো মূর্দ্ধি পৃষ্ঠে চ হৃদয়ে বাচি চক্ষুষি।
শ্রোত্রাদিষু চ সর্ব্বেষু মম বিষ্ণুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
ইতি সর্ব্বং সমুৎসৃজ্য ধ্যাত্বা সর্ব্বত্র বাচ্যুতম্।
বাসুদেবেত্যবিরতং নাম দেবস্য কীর্ত্তয়েৎ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু শয়ীতঃ প্রাক্‌শিরাস্ততঃ।
উদঙ্মিরা বা দৈত্যেন্দ্র চিন্তয়ন্ জগতঃ পতিম্॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

যে দিন বন্ধু-বান্ধব ক্ষেত্র-ধান্যাদি হইতে স্বেচ্ছাত মমতা বিনিবর্ত্তন করিয়া ইহজীবনের সমুদায় কৃতকর্ম্ম স্মরণ করতঃ মিত্রামিত্র, আত্মপর, সকলের নিকট হৃদয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ইহসংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিতে হইবে; পশ্চাৎ শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্ম হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষ্ণুতে সমর্পণ করিতে হইবে; যখন বন্ধুবান্ধবগণ সকলে চিত্ত হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকিবে; যখন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আলোক জগতের সমুদয় অবলম্বনই মুমূর্ষুর সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে তিরোধান করিতে থাকিবে; যখন ঊর্দ্ধ, অগ্র, মূর্দ্ধি, পশ্চাৎ, শ্রোত্র, চক্ষু, হৃদয়-কুত্রাপি কেহই আর অধিষ্ঠান করিবে না, তখন সেই জগদেকশরণ্য জগদ্‌বন্ধু সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই তাহার চক্ষু, কর্ণ, মন, সকলকে ব্যাপিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিবেন। পবিত্র দর্ভাসনে উত্তরশিরা বা পূর্ব্বশিরা হইয়া তখন বিষ্ণুর পরমপদই প্রার্থনা করিতে হইবে।

পৃথিবীরূপ বৃহচ্চুম্বকের উত্তর প্রান্ত আমাদের আবাসস্থান হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এ দেশে উত্তর প্রান্তের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণের প্রবলতা অধিক। জীবের মস্তিষ্কে সমুদায় স্নায়ুর মূলই নিহিত রহিয়াছে। সেই মূলগুলি যাহাতে সচৈতন্য থাকে, সেই উদ্দেশেই

মুমূর্ষুকে উত্তর শিরায় শয়ান রাখিতে হয়। এমন শুভজনক নিরবলম্বন যোগ জীবের ভাগ্য ইহজীবনে আর কখনই সঙ্ঘটিত হয় না। সে দিন সুপবিত্র গঙ্গাতীরে নাভিমগ্ন বা তদিতর স্থানে জলপূর্ণ গর্ত্তে পাদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া অথবা তুলসী-সন্নিহিত তিলবিকীরিত গোময়োপলিপ্ত মণ্ডলাঙ্কিত স্থানে শিলারূপী দেবতীর্থ শালগ্রাম সমীপে যোগবেশ ধারণ করিয়া শ্রবণ-মনন-নিনিধ্যাসনে ইষ্টদেবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

"কর্ম্মযোগাদ যদা দেহী মুঞ্চত্যত্র নিজং বপুঃ।
তুলসী-সন্নিধৌ কুর্য্যান্মণ্ডলং গোময়েন তু॥
তিলাংশ্চৈব বিকীর্য্যাথ দর্ভাংশ্চৈব বিনিক্ষিপেৎ।
স্থাপয়েদাসনে শুভ্রে শালগ্রামশিলাং তদা॥

প্রেতকল্পঃ।

পরলোকগমনোন্মুখ আত্মীয়ের যোগচর্চ্চার ব্যাঘাত না হয়, এজন্য আত্মীয়গণ সে দিন তাহার সর্ব্বাগাত্রে গন্ধমাল্যানুলেপন, ও ধাতুদ্রব্যে সর্ব্বছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে যোগীবেশে সজ্জিত করিয়া দিয়া থাকেন। পাছে মনোবৈকল্যে ইষ্টদেবের বিস্মৃতি হয়, একারণ আত্মীয়বর্গ বাদ্যাদ্যম সহকারে কেবল হরিনামানুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন "অয়মনিলমৃতমথেদং ভস্মান্তং কায়ঃ। ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রান্দোস্মর কৃতংস্মর" ইত্যাদি উপনিষদ্ সকল মুমূর্ষুর নিকট পঠিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ এমন যোগের দিন—এমন আনন্দের দিন জীবের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। একারণ মুমূর্ষুকৃত্য যথা ভাবে সম্পাদিত হইলে, আর্য্যগণ তাহাকেই সদ্‌গতি বলিয়া থাকেন।

"এবং জাতবিধানস্য ধার্ম্মিকস্য তদা খগ।
ঊর্দ্ধাচ্ছিদ্রেণ গচ্ছন্তি প্রাণাস্তস্য মুখেন হি।
মুখঞ্চ চক্ষুষী নাসে কর্ণৌ দ্বারানি সপ্ত চ॥
এভ্যঃ সুকৃতিনৌ যান্তি যোগিনস্তালুরন্ধ্রতঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত ভাবে মুমূর্ষুকৃত্য সম্পাদিত হইলে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির ঊর্দ্ধচ্ছিদ্র অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ, এই সপ্ত দ্বার দিয়া প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া থাকে। যোগিগণের প্রাণ তালুরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হয়। এই সদ্‌গতির

জন্যই পুত্র-পৌত্রের প্রয়োজন। নতুবা "লাতাপিত্রোর্মৃতৌ যেন ক
মুণ্ডনং নাহি আত্মজঃ স কথং জ্ঞেয়ঃ সংসারর্ণবতারকঃ ॥"

জীবনের মধ্যে যত প্রকার গুরুতর কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অন্ত্যে
সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম। গীতায় আছে,—

"যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

মুমূর্ষু কালে জীব যে ভাবে অবস্থিত করিয়া থাকিয়া দেহত্যাগ
পরকালেও তাহার সেইরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্মশানবন্ধুই আ
মতে পরম বন্ধু। যথা "রাজদ্বারে শ্মশানে চ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"

মৃত্যুলক্ষণ বিশেষরূপে অবগত না হইয়া লোকে পাছে যথাকালে মু
গঙ্গাবাসী বা তাহার অন্ত্যক্রিয়ার আয়োজন করিতে না পারে; পাছে
অসময়েও তাহাকে ঔষধ ভক্ষণের জন্য ব্যস্ত করে এবং প্রাণপ্রয়াণ
পাছে অনশন-ব্রত ("প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কুর্য্যাদনশনং খগ") ধৃত না হয়
এই জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি-বলে মৃত্যুলক্ষণগুলি—এমন কি
অনেক কাল পূর্ব্ব হইতেই এমন সুন্দররূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন
তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বস্তুতঃ আমরা ইহকালকে পর
এত অনুগত জানি বলিয়াই, আমাদের শাস্ত্রে মৃত্যুবিজ্ঞান ও নাড়ী
অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন জ
চিকিৎসা শাস্ত্রে সেরূপ নাই। আজিকাল আমরা সুসভ্য বলিয়া গর্ব্ব ক
ও পূর্ব্ব পুরুষগণকে অবোধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিতে শিখি
বটে" কিন্তু আমাদের জন্মকৃত্য ও মৃত্যুর কিছু মাত্র স্থিরতা নাই। সু
এখন আমরা শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় জন্মগ্রহণ করিতেছি—আবার তাহা
মত অযথা ভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়

যে দিন বন্ধু
করিয়া ইহজীবনে
সকলের নিকট
চিরদিনের জন্য
কর্ম্ম হইতে চিন্তা
যখন বন্ধুবান্ধবগণ
যখন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়
ক্রমে ক্রমে তিরে
শ্রোত্র, চক্ষু, হৃদয়-
জগদেকশরণ্য জগদ্
সকলকে ব্যাপিয়া স
উত্তরশিরা বা পূর্ব্ব
হইবে।

পৃথিবীরূপ বৃহ
অধিকতর নিকটবর্ত্তী
বিকর্ষণ গুণের প্রব
নিহিত রহিয়াছে।

ISSUE(S) MISSING